অতঃপর...

প্রকৌঃ মো: রফিকুল ইসলাম
(সহ সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক)
শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যান সমিতি, ঢাকা

অবাক ব্যাপার! কিছুদিন আগে যে ব্যক্তিটি ছিল মহাব্যস্ত, ফোনের পর ফোন দেখা সাক্ষাৎ সেবাগ্রহীতাদের ভিড়, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের আনা গোনা সব মিলিয়ে মহাব্যস্ত। খাবার সময় নেই, বিশ্রামের সময় নেই, ব্যস্ত আর ব্যস্ত। জীবনটা একেবারে হাঁফছে উঠছে। কিন্তু করার তো কিছু নেই। তাই মনে মনে ভাবে আর কিছু দিন পরেই তো অবসরে যাব, তখন হাতে অনেক সময় পাব, তখন প্রাণ খুলে আড্ডা দেব, বিশ্রাম নেব, আরও কত কী, কিন্তু অবসরে যাওয়ার পর সব পরিকল্পনা ভেস্তে গেলো, এখন আর কেউ ফোন করে না, খোঁজখবর নেয় না, সংগ দেয় না। কদাচিৎ ২/১ টা ফোন আসে। মনে হয় এখন আর কারো প্রয়োজন নাই, সব প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। এটাই কি নিয়তির বিধান। বয়স যত বাড়ছে ততই যেন অসহায়ত্ব, একাকিত্ব বাড়ছে। কিন্তু উপায়! উপায় তো পরিবার। পরিবার মানে যৌথ পরিবার, যেখানে বাবা-মা, চাচা-চাচি, সন্তান সন্ততাদি, নাতিপুতিদের সংগে মিলেমিশে কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে থাকা। যারা এ সুযোগ পায় তারা তো ভাগ্যবান। এ পরিবেশে সন্তানেরা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বৃদ্ধ বাবা-মাকে পরম পূজনীয় ব্যক্তি গণ্য করে যথাসাধ্য সম্মান ও সেবা করে থাকে। এটাই ছিল আমাদের সমাজের পারিবারিক ঐতিহ্য। যদিও এ সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে।

আর যারা পরিবার তথা সন্তান নাতিপুতিদের সংগে থাকতে পারে না তারা একাকিত্ব,অসহায়ত্ব সংগে দিনযাপন করে। করুণ অবস্থায় দিন চলে যায়। ছেলেরা চাকরি/কর্মের তাগিদে দেশ-বিদেশে অবস্থান করায় সংগে থাকতে পারে না। ছেলেরা মাঝে-মাঝে খরচের জন্য টাকা-পয়সা পাঠায়। কিন্তু ব্যস্ততার কারণে খোঁজ-খবর নেওয়ার সময় নাই। কাজেই তারা নিঃসংগ, একাকিত্বের দহনে দিনাতিপাত করে।

আবার অনেকের সন্তানেরা বাবা-মার দায়িত্ব নিতে চায় না, একসংগে থাকতেও চায় না। উপেক্ষা, অবহেলা আর বোঝা মনে করে। নিজেরা আরাম আয়েশে থাকে কিন্তু বৃদ্ধ বাবা-মায়ের খোঁজখবর রাখে না। খরচের টাকাও পাঠায় না। দৈনন্দিন এর খরচ, চিকিৎসা খরচ সব মিলিয়ে তাদের জীবন তো দুর্বিষহ ও যাতনাময়।

অনেক প্রবীণ আছে যাদের বাড়ি, গাড়ি, সম্পতির কোনো কিছুরই অভাব নাই। অভাব শুধু পরিবার। তারা নার্স রেখে সেবা নেয়। কিন্তু একাকিত্ব, নিঃসংগ সারাক্ষণ তাদের তাড়া করে। হতাশা আর দুশ্চিতায় মৃত্যুর প্রহর গোনে।

আর যাদের অর্থ নাই, পরিবার নাই, দেখার কেউ নেই তাদের অবস্থা কত করুণ ভাবা যায় না। কিছুসংখ্যক হয়তো বৃদ্ধাশ্রমে যায়।

যাদের জমানো অর্থ নাই তারা তো সম্বলহীন। আসলে তারা কি সম্বলহীন ছিলেন। সম্বলহীন হয়েছেন সন্তানদের লেখাপড়া, বিয়ে শাদী ইত্যাদির পিছনে ব্যয় করে। ভেবেছিলেন সন্তানেরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেলে আর চিন্তা কী। সন্তানদের সংগে বাকি জীবন সুখে-শান্তিতে কাটানো যাবে। কিন্তু সে স্বপ্নতো দুঃস্বপ্ন পরিণত হলো। অনেক সন্তানেরা আবার বিদ্রোপ ও বকাবকি করে বলে কেন তারা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করেনি। তাদের তো চিন্তা করা উচিৎ ছিল শেষ বয়সে কর্মহীন ও অচল অবস্থায় খাওয়া পড়া, চিকিৎসা ইত্যাদি বাবদ খরচ লাগবে। তারা সে চিন্তা না করে সন্তানদের উপর ভরসা করে বিভোর স্বপ্নে দিন গুজরাছে। তাই তাদের এ ভোগান্তি।

অনেক পরিবারে দেখা যায় বাবা-মার ভরণ-পোষণ সেবা, যত্ন এবং তাদের প্রতি যে দায়িত্ব কর্তব্য তা পালন করে না। সমাজের কলংকের ভয়ে সমাজের চোখে নিজেকে জাহির করতে সবার অজান্তে বাবা-মাকে ফেলে রাখে কোনো নির্জন অস্বাস্থ্যকর স্থানে। মায়া, মমতা, ভালোবাসা কোনো কিছুই তাদের স্পর্শ করে না।

প্রবীণেরা তার জীবন সায়াহ্নে এসে একাকিত্ব রোগে-শোকে বিপর্যস্ত জীবনযাপন করে। অনেক ক্ষেত্রে প্রবীণদের প্রতি অবহেলা দুর্ব্যবহার নির্যাতনের খবর পাওয়া যায়। সামাজিক অধিকার ও সুযোগ সুবিধা থেকে অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত। অনেকে নিগ্রহ, নির্যাতিত এবং বাস্তহারা।

কিন্তু এমনতো হওয়ার কথা নয়। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা তো এমন ছিল না। আমাদের ছিল বাবা-মা, চাচাচাচি, ছেলেমেয়ে,নাতিপুতি পরিবেষ্টিত যৌথ পরিবার। আবহমান বাংলার গৌরব, ঐতিহ্য ও অহংকার। পরিবার ছিল আনন্দ, কোলাহলপূর্ণ। আর্থিক সংকট, অভাব-অনটন থাকলে ও সুখ

শান্তিতে ভরপর ছিল। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভালোবাসা, বিশ্বাসযোগ্যতা, একতা বিদ্যমান ছিল। পরিবারের নবীন সদস্যরা প্রবীণদের সেবা, যত্ন নিত। এমনকি পাড়া-প্রতিবেশী প্রবীণদেরও সেবা করতে কার্পণ্যতা করত না।

সভ্যতার বিবর্তনে আধুনিকতার ছোঁয়ায় এ যৌথ পরিবারগুলো ভেংঙে শহর-গ্রামের অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিউক্লিয়ার বা ছোট পরিবারে পরিণত হওয়া। সেখানে শুধু বাবা-মা আর সন্তান। বৃদ্ধ বাবা-মার ঠাঁই নাই। যৌথ পরিবারের সংখ্যা এখন কমছে।

প্রবীণদের সমস্যা সমাধানে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রশংসনীয়। প্রবীণদের জন্য বয়স্ক ভাতা, পিতামাতার ভরণ-পোষণ আইন, পেনশন সুবিধা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

যেহেতু প্রবীণদের সংখ্যা ব্যাপক এবং আগামীতে এ সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে। তাই প্রবীণদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া দরকার। কেননা বার্ধক্য প্রতিটি মানুষের অবধারিত সমস্যা। আজকের নবীনরা আগামী দিনের প্রবীণ। তাই রাষ্ট্রের পাশাপাশি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজকে ব্যাপক উদ্যোগ ও ভূমকা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

অতঃপর প্রবীণদের স্বস্তিময় জীবন-যাপন এবং তাদের জীবন অর্থপূর্ণ পরিবর্তনের জন্য অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য, সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিকূল ও বিরূপতাকে সহ্য ও উত্তীর্ণ হওয়ার সক্ষমতা প্রয়োজন। এটা অর্জনে নীতিগত, কৌশলগত ও কর্মসূচিগত সহায়তা অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রবীণদের মধ্যে বহুসংখ্যক প্রবীণ আছেন যারা নানামুখী সমস্যা সমাধান এবং উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাসম্পন্ন। অপরদিকে নবীনেরা সাহসী, উদ্দীয়মান ও প্রতিভাদীপ্ত। কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা খুবই কম। তাই প্রবীণরা নবীনদের সংগে নিয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। নবীন- প্রবীণ মেলবন্ধনের মাধ্যমে সকলক্ষেত্রে সফলতা সম্ভব।

শিবগঞ্জের নদী ও পরিবেশ

মো. মিঠুন মিয়া
সহকারী অধ্যাপক
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

নারী, নদী ও জল। তিনটিই মানবজীবনের অস্তিত্ব। নদী মানেই জীবন, সভ্যতা, নদী মানেই সংযোগ। নদীই বাংলাদেশ নামক ভূ-খণ্ডটির জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতি বিনির্মাণ করেছে। নদীই এই জনপদের স্রষ্টা। নদী সৃজন করেছে জীবন জীবিকা, জুগিয়েছে খাদ্য। নদীর সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলের মানুষের সম্পর্ক অতিনিবিড় ও জীবনঘনিষ্ঠ। আজকের শিবগঞ্জ উপজেলায় পুণ্ড্র জনপদটি গড়ে উঠেছিল। মূলত নদীর কারণে এই সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছিল। শাহ সুলতান মাহীসওয়ার বলখ থেকে নদীপথে মাছের পিঠে করেই মহাস্থানগড় জয় করেছিলেন। গ্রামের পাশে বহমান স্রোতস্বিনী নদী, চলমান নৌকা, জেলেদের কর্মব্যস্ততা, পাড়ে শিশুদের দুরন্তপনা ছিল শিবগঞ্জের চিরায়ত রূপ। এক সময় নদীই জুগিয়েছে শিবগঞ্জের মানুষের জীবনের গতি, সৃজন করেছে সম্প্রীতি, যুক্ত করেছে জীবনের নতুন মাত্রা। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় শিবগঞ্জের নদীগুলোর আজ বেহাল দশা। নদী হারিয়েছে তার নান্দনিক রূপ। নদীর সাথে মানুষের বন্ধন আজ প্রায় শিথিল। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক কারণ, মনুষ্য সৃষ্ট কারণসহ নদী ভরাট ও দূষণের কবলে শিবগঞ্জের নদী। ইতোমধ্যেই নদীগুলো হতে অনেক মাছ বিলুপ্ত হয়েছে, অনেক মাছ বিলুপ্তির প্রহর গুনছে। সাথে, সাথে নির্ভরশীল অন্যান্য প্রাণিকুল ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। প্রভাব পড়ছে সমগ্র প্রতিবেশে, বাস্তুসংস্থানের ওপর। নদীগুলো সংরক্ষণে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। শিবগঞ্জ উপজেলার পাশে দিয়ে বেশ কয়েকটি নদ-নদী বয়ে গেছে। উপজেলাটি মূলত করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত হলেও আরও বেশ কিছু নদ-নদীর শাখা-প্রশাখার সাথে মিলিত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের শস্যভান্ডার খ্যাত শিবগঞ্জ উপজেলার মাটি, আবহাওয়া ও পরিবেশ কৃষিবান্ধব। ফসল উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী। কৃষি ফসল উৎপাদনে কৃষকরা অন্যান্য এলাকার চেয়ে এগিয়ে।

করতোয়া

শিবগঞ্জের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ নদী হচ্ছে করতোয়া। কেবল শিবগঞ্জের নয় করতোয়া উত্তরবঙ্গের এক কালের সর্বপ্রধান ও পবিত্র নদী। প্রাচীন নগরী পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী এ নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। করতোয়া নদী আজ বিলুপ্তির পথে ধুঁকতে থাকা একটি নদী। দখলে-দূষণে ক্রমেই ছোট হয়েছে করতোয়া। অথচ একসময় ভরা যৌবন ছিল তার। বর্ষায় ফুলে-ফেঁপে উঠে দুই ধার ভাসিয়ে নিয়ে যেত। বাংলাদেশ-ভারতের একটি আন্তঃসীমান্ত নদী করতোয়া। মানচিত্রে নদীটি দেখতে সর্পিলাকার। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক করতোয়া নদীর পরিচিতি নম্বর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের নদী নম্বর ১৩। প্রচলিত আছে, বাংলা শব্দ কর বা হাত এবং তোয়া বা পানির সমন্বয়ে এই নদীর নামকরণ করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের সর্বপ্রধান নদী হিসেবে একসময় এর সুনাম ছিল। করতোয়ার জন্ম নিয়ে গল্পের শেষ নেই। হিন্দুদের অনেকের বিশ্বাস, পার্বতীকে বিয়ে করার সময় শিবের হাতে ঢালা পানি থেকে জন্ম হয় নদীটির। মহাভারতসহ বিভিন্ন শাস্ত্রীয় গ্রন্থে এই নদী সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া যায়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করে, করতোয়ায় বাসনা পূরণ ও পাপমোচন হয়। সারা বছর প্রবহমান থাকত বলে করতোয়ার আরেক নাম 'সদানীরা'। সদা অর্থ সব সময় এবং নীরা অর্থ পানি। ভুটান সীমান্তের উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন হয়ে বিভিন্ন উপনদীর জলধারা বক্ষে ধারণ করে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। বৃহত্তর রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলার মধ্য দিয়ে রংপুরের প্রায় ১৯ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে কতিপয় জলধারার সংযোগে সৃষ্ট নতুন উৎসমুখ থেকে আনুমানিক ২৪২ কিমি দক্ষিণে ইছামতী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। উত্তরতম প্রবাহে এর নাম তিস্তা, এ তিস্তার জলধারা তিনটি খাতে প্রবাহিত হতো করতোয়া, আত্রাই ও পুনর্ভবা। গতিপথের বিভিন্ন অংশে করতোয়া এখনও পুরাতন তিস্তা নামে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। বর্তমান করতোয়া কিছুটা পথ দিনাজপুর ও রংপুর জেলার সীমানা নির্ধারণ করে প্রবাহিত হয়েছে। অতঃপর গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা অতিক্রম করে বগুড়া জেলায় পড়েছে। রংপুর জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় নদীটি পূর্বদিক থেকে আসা দুটি উপনদী সর্বমঙ্গলা এবং যমুনেশ্বরীকে গ্রহণ করেছে।

বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানার ময়দানহাটা ইউনিয়নস্থ পলাশী মৌজার পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করে কালাই-শিবগঞ্জ থানা সীমানা বরাবর প্রায় ২ মাইল প্রবাহিত হয়ে কচুয়া মৌজার পশ্চিম দিকে একটি বাঁক নিয়ে গোটিলা, উত্তর কৃষ্ণপুর, ছান্দার, কীচক ইউনিয়নস্থ পাতাইর মৌজায় পৌঁছে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। ১টি শাখা পাতাইর এ বাঁক নিয়ে উত্তর দিকে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে মাদারগাছি পার হয়ে সোজা মাতিয়ানে পড়ে। ২য় শাখাটি সোজা দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে মাতিয়ান, গোপীনাথপুর, আটমুল ইউনিয়নের চককানু; শিবগঞ্জ ইউনিয়নের চক গোপাল, বিহার ইউনিয়নের নাতমরিচায়

এসে এটি ২ ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১টি শাখা বগুড়া-গাইবান্ধা সড়ক অতিক্রম পূর্বক আঁকাবাঁকা পথে অগ্রসর হয়ে যথাক্রমে রায়নগর ইউনিয়নের তেখড়িয়া, আচলাইতে এসে আবার দ্বিধাবিভক্ত হয় যার প্রথমটি মোকামতলা ইউনিয়নের ভাগকোলা, আচলাই, সারাজী পার আচলাই, মুরদাপুর দিয়ে গাইবান্ধা বগুড়া সড়ক অতিক্রম পূর্বক সোনাতলা থানায় প্রবেশ করে, আর দ্বিতীয়টি আচলাই, পার-আচলাই আলোকদিয়ার, রায়নগর ইউনিয়নের করতিকোলা, চান্দিজান, অনন্তবালা, আবার বগুড়া-গাইবান্ধা সড়ক অতিক্রম পূর্বক নগর কান্দিতে ৩/৪টি বাঁক নিয়ে বগুড়া সদরে প্রবেশ করে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, প্রথম বিভক্তির ২য় শাখাটি সোজা দক্ষিণে বিহার ইউনিয়নস্থ ডাহিলা, ভাসুবিহার হয়ে নাগর নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। করতোয়া নদীটি বগুড়া সদর থানার গোকুল ইউনিয়নস্থ পার দক্ষিণ ভাগ, ধাওয়া কোলা, বাঘাপাড়া, ঠেংগামারা, নিশিন্দারা ইউনিয়নের বারবাকপুর, ফুলবাড়ী, বগুড়া পৌরসভাস্থ চেলুপাড়া, সাবগ্রাম ইউনিয়নের নাটাইপাড়া, ভাতকান্দি, সুলতানগঞ্জ ইউনিয়নের মালতীনগর, চক লোকমান, লতিফপুর, বেতগাড়ী, সুজাবাদ, খোট্টাপাড়া ইউনিয়নের ডুরালিয়া, খালিশাকান্দি, চুপিনগর ইউনিয়নের ছবিনগর, ত্রিকুসতা, আড়িয়া ইউনিয়নের আড়িয়া, জামালপুর হয়ে শেরপুর থানার গাড়িদহ ইউনিয়নস্থ কানুপুর মৌজায় প্রবেশ করে এবং আঁকাবাঁকা পথে রামনগর, বাংগারা, জোয়ানপুর, হাজিপুর, শেরপুর পৌরসভার রনবীরবালা, মির্জাপুর ইউনিয়নের গেরুসা, কৃষ্ণপুর, মদনপুর, কাশিয়াবালা হয়ে বিনোদপুরে হলহলিয়ার সঙ্গে মিশে যায় এবং মূল শাখাটি বাঁক নিয়ে ছাতরা, ছাতরা হারাজীতে এসে একটি পরিত্যক্ত পথ তৈরি করে। অর্থাৎ অশ্বখুরাকৃতি ধরনের একটি ভূমিরূপ সৃষ্টি করে নিম্নদিকে অগ্রসর হতে থাকে যা গারো, হলদিবাড়ি, দড়িহাসড়া, সদর হাসড়া, ঘোগা, সিরাজগঞ্জ-বগুড়া সড়ক ছেদ পূর্বক গড়াই মৌজার পশ্চিম হয়ে মরা করতোয় নামে বড়াইদহ হয়ে সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ থানায় প্রবেশ করেছে। নদীটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০/৫৫ মাইল এবং এর তীরে দাড়িদহ, বগুড়া, শেরপুর, মির্জারপুর, ঘোগা ইত্যাদি সুপরিচিত জনপদ অবস্থিত। বগুড়ার শেরপুরে করতোয়া দুই ভাগ হয়ে গেছে। পুরনো প্রবাহ মিলেছে চলনবিলে আত্রাই নদে। নতুন প্রবাহ ফুলজোড় নামে প্রবাহিত হয়েছে। আবার শেরপুর উপজেলার মির্জাপুরে কাশিয়াবালা এলাকায় করতোয়া দুই ভাগ হয়েছে। এর একটি শাখা ফুলজোড় নদ, অন্যটি সিরাজগঞ্জের সলঙ্গা থানার ভূঁইয়াগাতিতে সূর্য নদের সঙ্গে মিলেছে। অপরিকল্পিত বাঁধ, দখল, দূষণ ও পানিপ্রবাহের অভাবে এককালের খরস্রোতা করতোয়া এখন মৃতপ্রায়। তবে সুষ্ঠু উদ্যোগ নিলে এখনো বাঁচানো সম্ভব নদীটিকে।

গাংনই

গাংনই নদী বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের গাইবান্ধা জেলার একটি নদী। নদীটির দৈর্ঘ্য ৩১ কিলোমিটার, গড় প্রস্থ ৩৫ মিটার এবং নদীটির প্রকৃতি সর্পিলাকার। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বা "পাউবো" কর্তৃক গাংনই নদীর প্রদত্ত পরিচিতি নম্বর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের নদী নং ২৮। শিবগঞ্জ

থানার উত্তর পশ্চিমস্থ মৌজা ময়দানহাটা ইউনিয়নের পলাশী থেকে বেরিয়ে জয়পুরহাটের কালাই থানা-শিবগঞ্জ থানা সীমানা বরাবর মাইল তিনেক অগ্রসর হয়ে গোতিলা নামক স্থানে পূর্ব দিকে ২/৩ টি বাঁক নিয়ে উত্তর কৃষ্ণপুর, চান্দার হয়ে কিচক ইউনিয়নের পাতৈর, জয়পুরহাট কীচক রাস্তার মোড় নিয়ে সোজা গোপীনাথপুর ইউনিয়নের চককানু, শিবগঞ্জ ইউনিয়নের চক গোপাল, বিহার ইউনিয়নের নাতমরিচা, বানাইলের নিকট করতোয়ার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ইহার দৈর্ঘ্য ১০/১২ মাইল। এর তীরে কীচক, বিহার ইত্যাদি জনপদ অবস্থিত। এ নদীতে সব ঋতুতে পানি থাকে না।

নাগর

বাংলাদেশে দুটি নাগর নদী রয়েছে: একটি বগুড়া জেলার শিবগঞ্জের কাছে করতোয়া নদী থেকে বের হয়ে প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এবং পরে দক্ষিণে বাঁক নিয়ে নাটোর জেলার সিংড়া-তে আত্রাই নদীতে পড়েছে। নাগরের একটি উপনদী উত্তরভাগের উঁচুভূমি থেকে উত্থিত হয়ে নাগরের সঙ্গে মিলেছে, বস্তুত এটাই নাগরের উৎস। নদীটির মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১০৫ কিমি। চলার পথে নদীটি দুপচাঁচিয়া-কাহালু (বগুরা), আদমদীঘি-নন্দিগ্রাম (বগুরা), রানীনগর (নওগাঁ)-নন্দিগ্রাম (বগুড়া) ইত্যাদি উপজেলাগুলির মধ্যে সীমা নির্দেশ করে। অপরটি বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত জেলা পঞ্চগড়ের আটোয়ারী ও পঞ্চগড় সদর উপজেলা এবং পশ্চিমবঙ্গ-এর সীমানার মিলনস্থলের প্রায় কাছাকাছি আন্তর্জাতিক সীমান্ত ঘেঁষে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এটিকে অনেকে সীমান্ত নাগর নামেও চিহ্নিত করে থাকে। পঞ্চগড় থেকে প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং পরে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে ঠাকুরগাঁও-এর হরিপুরের কাছে নদীটি পুনরায় পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে। নদীটির গতিপথ অধিকাংশ সময়ই ভারত-বাংলাদেশের সীমানা নির্দেশ করেছে। বাংলাদেশ অংশে এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১২৫ কিমি। কিছুটা আকস্মিক বন্যা প্রবণতা রয়েছে, তবে তেমন একটা ক্ষয়-ক্ষতি করে না। শুষ্ক মৌসুমে পানি থাকে না, তবে কৃষকরা বর্ষা মৌসুমের পানিকে বাঁধ দিয়ে আটকে রেখে সেচের জন্য ব্যবহার করে থাকে। করতোয়ার শাখা নদী নাগর বগুড়া জেলার অন্যতম নদী। এটি বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানার আটমূল ইউনিয়নস্থ জগদীশপুরের নিকট করতোয়া থেকে বের হয়ে প্রায় ১০ মাইল বগুড়া ও জয়পুরহাট জেলা সীমানা বরাবর প্রবাহিত হয়ে দুপচাঁচিয়া থানায় প্রবেশ করে। তারপর দুপচাঁচিয়া থানার চামরুল ইউনিয়নস্থ আমলপুরের ১.৫ মাইল পূর্ব দিয়ে মাসিমপুর, চামরুল, মোস্তফাপুর, পোড়াপাড়া, আটগতি, দুপচাঁচিয়া ইউনিয়নস্থ খালাস ধাপ, সঞ্চয়পুর, আলোহালী, তালোড়া ইউনিয়নের তালপাড়া, তালোড়া রেল স্টেশনের পূর্ব পার্শ্ব দিয়ে কিছুদূর অতিক্রমপূর্বক ধাপঘোগা খালী অর্থাৎ পরানপুর, চাপাপুর, গালিয়া, দমদমার নিকট সিংড়া থানায় প্রবেশ করে সিংড়া ব্রিজের কাছে আত্রাই নদীতে পড়েছে। নদীটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৭৫ মাইল। নদীটি খুবই সর্পিল প্রকৃতির এবং বর্ষাকলে বেশ পানি থাকে। নদীটি বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানা, জয়পুরহাট জেলার কালাই ও ক্ষেতলাল থানা এবং বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া, শেরপুর, আদমদীঘি, কাহালু ও নন্দীগ্রাম থানা সীমানা বরাবর প্রবাহিত। তাই এ নদীটিকে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমানা এবং জেলা থানা সীমানা নির্ণয়কারী নদী হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়।

শিবগঞ্জে করতোয়া, নাগর ও গাংনই নদী দখল এবং নাব্য সংকটে ক্রমশ হারাচ্ছে তাদের রূপ। নদীগুলো থেকে অবৈধভাবে মাটি কেটে নেওয়া, বালু উত্তোলন, নদীর জায়গায় চাষাবাদ ও নাব্য সংকটের কারণে নদীর গতিপথ ও পানি প্রবাহ কমে গেছে। ফলে অনেকটা মরা নদীতে পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছে এসব নদী। পানি না থাকায় পৌষের প্রথম থেকেই স্থানীয় কৃষকদের বোরো ধানের বীজতলা ও আগাম ধান চাষে আগ্রহী করে তুলেছে নদীগুলো। পাশাপাশি বিলীন হয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ। এসব নদীর প্রায় ৩০ ভাগ দখল ও ৪০ ভাগ খননের অভাবে নাব্য হারিয়েছে। চৈত্র মাস আসার আগেই করতোয়া, নাগর ও গাংনই নদী পানি শূন্যতায় ভুগছে। ২০ ভাগও পানি নেই। অথচ আশির দশকে এসব নদীতে মাঝিরা কর্মব্যস্ত খেয়াঘাটে মানুষ পারাপার করত, জেলেরা মাছ ধরত। নৌকা চলত। নদীপথেই ধান, পাটসহ নানা রকমের কৃষি ফসল শিবগঞ্জ, দাড়িদহ, কীচক, উথলী ও মহাস্থান হাটে বেচাকেনার জন্য মানুষ নিয়ে আসতো। শিবগঞ্জের পুরনো বড় হাটগুলো করতোয়া, নাগর ও গাংনই নদীর কূল ঘেঁষেই অবস্থিত। নদীর চারদিকে বীজতলা, ধানের আবাদ ও আলুর খেত। বর্ষার পলি পড়ে নদীগুলোর ৭০ শতাংশ এখন চাষের জমিতে পরিণত হয়েছে। নদীর মাঝখান দিয়ে এখন নালার মতো করে পানি জমে আছে। কোথাও আবার সামান্য একটু অংশজুড়ে হাঁটুপানি। উপজেলার নাগরব্রিজ, অর্জুনপুর, আমতলী, দেবপুর, গুজিয়া, ভাগকোলা, আচলাই, আরাজী পার আচলাই, মুরদাপুর, আলোকদিয়া, করতকোলা, অনন্তবালা, কৃষ্ণপুর, চান্দার, পাতাইর, চককানু, চক গোপাল, নাটমরিচাই, বানাইল, মাটিয়ান, গোপীনাথপুর ও আটমূল এলাকায় গেলে চোখে পড়ে এসব দৃশ্য। নদী শুকিয়ে যাওয়ায় কৃষকরা ধানের চারা রোপণ করে। সময়ের বির্বতনে ঐতিহ্যবাহী করতোয়া নদী পানিশূন্য হয়ে পড়ায় এলাকার অধিকাংশ কৃষকরা নদীতে বীজতলা তৈরি করে বোরো ধানের চারা উৎপাদনের জন্য ধানের বীজ বপন করে। তারা এতে উপকৃত হলেও এলাকার জেলে ও মাঝিরা পূর্বপুরুষদের পেশা ছেড়ে অন্যান্য পেশায় জীবিকা নির্বাহ করছে।

তথ্যসূত্র

https://shibganj.bogra.gov.bd/bn/site/page/SM6j-
https://bn.banglapedia.org/index.php?title
https://alokitobogura.com
https://dailybangladeshmedia.comhttps://www.protidinersangbad.com/whole-country/438793
https://71vision.com/article/194821

গত বছরে প্রকাশিত স্মরণিকার প্রচ্ছদ

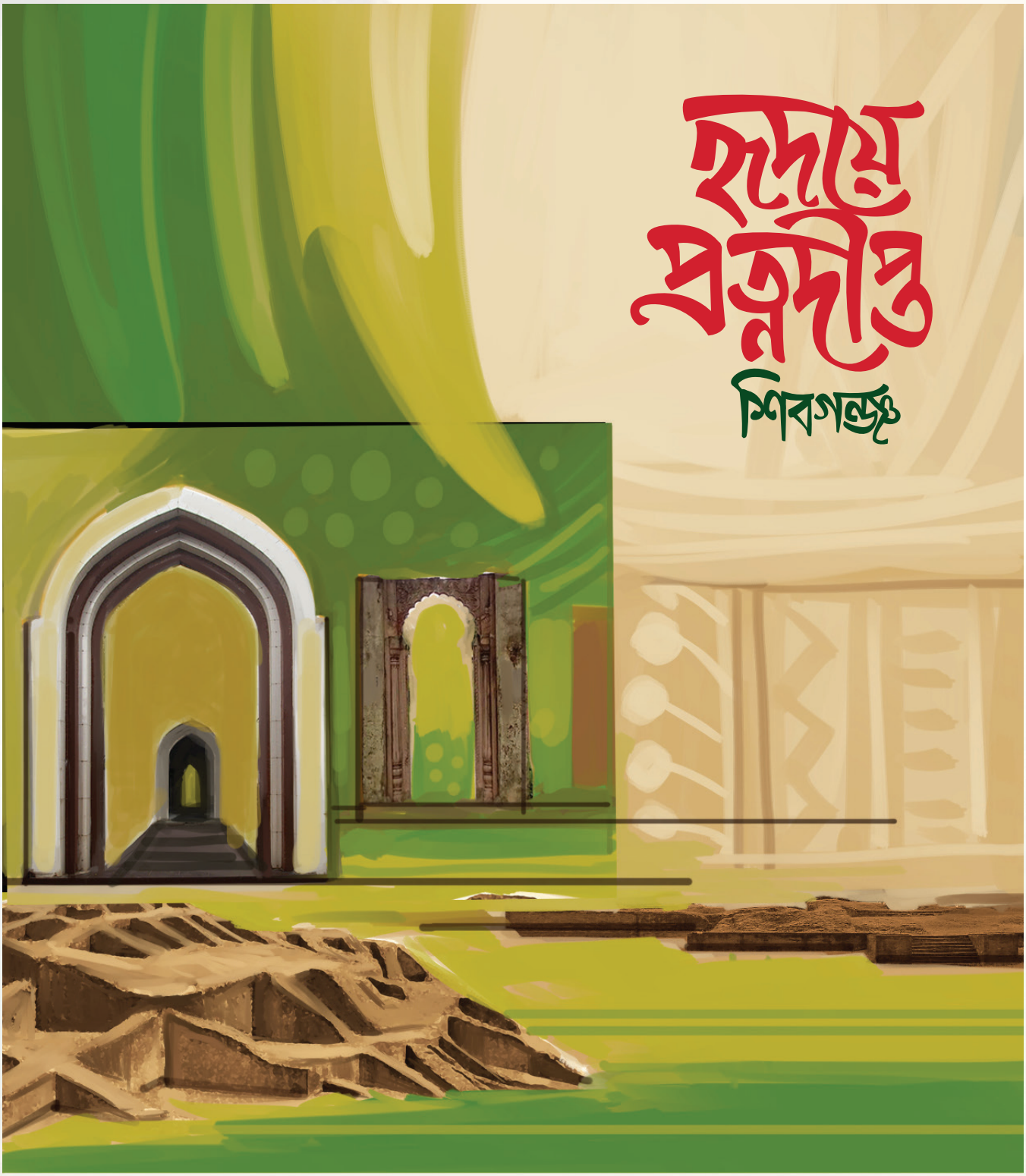

শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতি, ঢাকা।

১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

পাখির চোখে শিবগঞ্জ

পাখির চোখে শিবগঞ্জ

শিবগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন

শিবগঞ্জ মডেল মসজিদ

শিবগঞ্জ পৌরসভা

শিবগঞ্জ নাগর ব্রীজ

মহাস্থানগড়

মহাস্থানগড় মাজার

মহাস্থান জাদুঘর

মহাস্থান বাজার

Photography: Drone Viewpoint BD

পাখির চোখে শিবগঞ্জ

গোবিন্দ ভিটা

মসলা গবেষণা কেন্দ্র

ভাসু-বিহার

ভাসু-বিহারে অতিথি পাখি

আলিয়ার হাট

আলিয়ার হাট সুইচগেট

ভায়ের পুকুর

কিচক বাজার

Photography: Drone Viewpoint BD

পাখির চোখে শিবগঞ্জ

পিরব চারমাথা

মোকামতলা

আটমূল

উথুলি নবান্ন উৎসব

আমতলী

বুড়িগঞ্জ

বিউটি পার্ক

দেউলীর আকর্ষণ

Photography: Drone Viewpoint BD

আমার কালকুঠুরির অন্ধকার জীবন হলেও বাক স্বাধীনতা ফিরুক, বৈষম্য দূর হোক ...

মো. ওমর ফারুক
আলাদিপুর, শিবগঞ্জ
৪ আগস্ট ২০২৪ গুলির আঘাতে দু'চোখ অন্ধ

সকাল আটটা, ঘুমহীন রাত কাটিয়ে সকালের ভ্যাপসা গরমে উত্তপ্ত বিছনায় শুয়ে থাকতে আর ভালো লাগছে না। সকালের নাশতা না করে বিলের পাড়ের বিশাল বট গাছের লম্বা শিকড়ে বসে আছি। হালকা বাতাসে বটগাছের পাতা দোল খাওয়ার তালে তালে একমাস আগের অতীতে ফিরে গেলাম।

আমি ওমর। সকালে মেসের খিচুরি না খেয়ে ক্যাম্পাসে হাজির হওয়ার সাথে সাথেই বন্ধুর প্রশ্ন কীরে খবর কিছু জানিস? আমি অবাক চাহনি নিয়ে বললাম কী খবর জানি না তো। বন্ধু বলল, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন করতে গিয়ে রংপুরে আবু সাঈদ নামক ভার্সিটিপড়ুয়া এক যোদ্ধা পুলিশের গুলিতে মারা গেছে এবং অনেকে আহত হয়েছে। এ কথা শোনার সাথে সাথেই নিজেকে আর দমিয়ে রাখতে পারলাম না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম যে, হই শহিদ হব তবুও এই আন্দোলন থেকে আর পিছু হাটব না। সামনে পাহাড় সমান বাধা আসলেও তা টপকিয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ। এই মনোবলকে সাথে নিয়ে সরকার ও শোষকদের বাহিনীর নানা হামলা হুমকি, হুংকার, হত্যাকে পাশ কাটিয়ে আন্দোলন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করলাম। আন্দোলনের এই পথিমধ্যে কত শত ভাইয়ের জীবন গেল, কত শত ভাইবোন হাত হারাল, পা হারাল, চোখের দৃষ্টি হারাল, তার হিসাব অগণিত। স্বৈরাচারের এই কঠিন দমনপীড়নে ছাত্রসমাজ পিছু হটেনি বরং তাদের অন্যায়-অবিচার সমর্থন করে কঠোর আন্দোলনের ডাক দেয়। ফলে আন্দোলনটা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন থেকে স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনে রূপ নেয়। ফলে সারা দেশের ছাত্র-জনতা রাস্তায় নেমে আসে। ফোনের রিংটোনে অতীত থেকে ফিরে আসি। বন্ধু ফোন দিয়েছে। দ্রুত শহরে ফিরতে হবে ছাত্র জনতা একতাবদ্ধ হয়েছে। স্বৈরাচার থেকে মুক্তির পথ হিসেবে আন্দোলনকে বেছে নিয়েছি। প্রতিটি শহর থেকে মানুষ এখন রাজধানীমুখী হয়েছে। আমরা ছাত্ররাও পিছুপা না হয়ে ৪ আগস্ট এ নিজ শহর থেকে রাজধানী ঢাকার উদ্দেশে ভোরবেলা যাত্রা শুরু করি। ৪ আগস্ট ২০২৪ ট্রেনের মতো ঝিক ঝিক করতে করতে ৩ রাস্তার মোড়ে থামলো বাসটি, সামনে আর এগোবে না। গন্তব্যর অনেক কাছে এসে থামতে হলো উত্তপ্ত দুপুর, সূর্যমামা ঠিক মাথার উপর কালো পিচের রাস্তায় যেন লেলিহান শিখা জ্বলছে, শরীর বড্ড খারাপ, হাঁটতে মন চায় না কিন্তু মনে চেতনা সমাবেশে আমাকে পৌঁছাতেই হবে। মনের এই প্রবল উত্তেজনাকে পুঁজি করে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে হাটা শুরু করলাম। দৃশ্য বড় বড় দালান সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো শুকনো চাহনি নিয়ে সামনে তাকিয়ে আছে। কিছু পথ অতিক্রম করে দেখি চলছে এক মহাযুদ্ধ। এ যেন ফিলিস্তিন ইসরাইলের যুদ্ধ। লোকমুখে শুনি ছাত্র জনতা নিজের দাবি আদায় করেই ছাড়বে। বিনিময়ে হোক যতই বুকের তাজা রক্ত। এমন কথা শোনার সাথে সাথে একজন ছাত্র হিসেবে নিজেও এ যুদ্ধে শামিল হলাম। ছোট ছোট ইটের টুকরো ও পাথরের টুকরো ছাড়া ছিলো না আমাদের কোনো অস্ত্র, কিন্তু নিজেদের ছিল কঠিন দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, যে আমাদের দাবি আদায় করেই ছাড়বো, দেশকে রাক্ষসী ও স্বৈরাচার মুক্ত করেই ছাড়বো। বিনিময়ে আসুক যত বাধা শেষ নিঃশ্বাস অবদি এই চেতনাই লড়বো। চলছে এক মহাযুদ্ধ। ছাত্র-জনতার অস্ত্র, বুক ভরা সাহস ও ইটের টুকরো। অপরদিকে স্বৈরাচারের আনসার বাহিনী ছিল মিছিলের দিকে তাক করে অস্ত্রে সুসজ্জিত। চোখের সামনে তাদের গুলিতে কত ছাত্র জনতার ঝরছে তাদের তাজা রক্ত, হারিয়েছে কত প্রাণ। তাদের আগ্রাসনের ভয়াবহতা দেখে মিছিলের সামনে উপস্থিত আমরা ছাত্র-জনতা তাদের সাথে শান্তি চুক্তিতে পৌঁছাই। ফলে তারা গুলি করা বন্ধ করে। আমরাও ছাত্র-জনতা তাদের উপর বিশ্বাস করে তাদের সামনে দিয়ে রাজধানী ঢাকার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করলাম। মিছিলের মধ্যভাগ আনসার ব্যাটালিয়ান অতিক্রম করার সময় হঠাৎ তাদের সামনে অবস্থিত ছাত্র-জনতার মুখ ও বুককে উদ্দেশ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি করতে শুরু করে। মিসাইলের গতিতে অসংখ্য বুলেট আমাদের চোখেমুখে আঘাত হানে। যার ফলে অনেকে হারায় নিজের ও আমার মতো দু'চোখের দৃষ্টি। ৫ আগস্ট দুপুর ১২টায় জ্ঞান ফেরার সাথে সাথেই নিজেকে আবিষ্কার করলাম কালকুঠুরিতে। যেখানে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। ভয়ে জোরে চিৎকার দেওয়ার সাথে সাথেই পাশ থেকেই ছোট ভাই ফরহাদ সাহস দেয় ভয় নেই, আমি আছি তোমার সাথে। পুরো দেশের মানুষ রয়েছে তোমার সাথে। এমন কষ্টের মাঝেও মুখে ফোটাই এক চিলতে হাসি, যখন শুনি স্বৈরাচারের পতন হয়েছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে। দেশের মানুষ কথা বলার স্বাধীনতা পেয়েছে...

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহত শিক্ষার্থীর পাশে ঢাকাস্থ শিবগঞ্জ উপজেলা(বগুড়া) কল্যাণ সমিতি

মোহাম্মদ আলী আঞ্চলিক প্রতিনিধি বগুড়া

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহত শিবগঞ্জের মেধাবী শিক্ষার্থী মোঃ ওমর ফারুকের সুচিকিৎসার খোঁজ খবর নিচ্ছেন ঢাকাস্থ শিবগঞ্জ উপজেলা(বগুড়া)কল্যাণ সমিতি। এছাড়াও সমিতির পক্ষ থেকে নগদ ১০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। আহত শিক্ষার্থী মোঃওমর ফারুক বর্তমানে ঢাকার শ্যামলীর জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে ভর্তি আছেন। আহত ওমর ফারুক শিবগঞ্জ উপজেলার আলাদীপুর গ্রামের আব্দুল বাসেদের পুত্র। আহত ওমর ফারুক বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর চতুর্থ সেমিস্টারের মেধাবী শিক্ষার্থী। গত ৪ আগস্ট বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে বগুড়া সাতমাথায় পুলিশের রাবার বুলেটের নির্মম আঘাতে তার দুই চোখ অন্ধ প্রায়। তার স্বজন, হাসপাতাল ও ডাক্তারের খোঁজ খবর নিয়ে জানা যায় তার দুই চোখের অবস্থা ভালো না, সুচিকিৎসা দরকার। ঢাকাস্থ শিবগঞ্জ উপজেলা(বগুড়া) কল্যাণ সমিতির সভাপতি জনাব ড.কাজী মোঃ ইমদাদুল হক,সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ হাসেমুজ্জামান, সহ-সভাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল(অবঃ) মোঃ নাসিমুল গনি ববি, কৃষি ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক জনাব কৃষিবিদ মুহাম্মদ তাহাজ্জত আলী, দপ্তর সম্পাদক জনাব মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক ও প্রচার সম্পাদক জনাব মোঃ আব্দুল আলিম সহ আরো অনেকে হাসপাতালে উপস্থিত থেকে তার খোঁজ খবর নেন ও সমিতির পক্ষ হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। সমিতির সভাপতি জনাব ড. কাজী মো. ইমদাদুল হক সমিতির সাধ্য মোতাবেক আন্দোলনে আহতদের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।সমিতির সহ সভাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) জনাব মোঃ নাসিমুল গনি ববি জানান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শিবগঞ্জ উপজেলার যারা আহত-নিহত হয়েছেন তাদের তালিকা তৈরির জন্য জরুরি ভিত্তিতে যোগাযোগ করতে বলেন। সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ হাসেমুজ্জামান উপজেলার আহত/নিহতদের পাশে সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসার অনুরোধ জানান।

জুলাই বিপ্লব ও আমাদের অঙ্গীকার

ব্রিগে. জেনারেল (অব.) মো. নাসিমুল গনি
পিএইচডি, এএফডব্লিউইসি, পিএসসি
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী
উপদেষ্টা, শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতি, ঢাকা

বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশের রূপান্তরের ইতিহাস সুনির্দিষ্টভাবে পাল বংশের দশ হাজার বছর আগের। জুলাই বিপ্লব ২০২৪ একটি যুগান্তকারী ঘটনা প্রবাহ। প্রারম্ভিক ইতিহাসের অস্তিত্বকে স্মরণ করে বারংবার এদেশের আপামর জনগণ বৈষম্যহীনতা, অনাচার,অত্যাচার এবং লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে যুগে যুগে ও সময়ের ডাকে লড়াই করেছে। হাজার হাজার ছাত্র-জনতার হত্যা, আহত ও নিপীড়নের ফসল অতি কষ্টে পাওয়া আমাদের এই বিপ্লব। এই বিপ্লবের গতিধারা ও আদর্শ বাংলাদেশকে ছাড়িয়ে দেশ হতে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্বের বিস্ময় হিসেবে বাংলাদেশ আজকে পরিচিত পাচ্ছে। বিশ্বায়নের এই যুগে আমাদের নতুন বাংলাদেশের স্বপ্নকে ত্বরান্বিত ও বাস্তবায়িত করতে সবার দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। অতীব দুঃখের বিষয় হলো যে এদেশের ভাগ্যে প্রায় সকল সময় সফলতার পরবর্তীতে বিশাল অসফলতা, দ্বন্দ্ব এবং পরাজয়ের কালিমা নিরন্তর আমাদের তাড়া করেছে। সম্ভবত এ কারণেই ৩৬০ জন আউলিয়া পদস্পর্শে উজ্জীবিত দেশ বারংবার ঘুরে দাঁড়ায়।

জুলাই বিপ্লব এমন একটি বাস্তবতা। তাই এটিকে আর প্রশ্ন করার সুযোগ নেই। এই বিপ্লবের সুদীর্ঘ পথ চলাতে সবার অবদানকে স্মরণ করে আমাদেরকে ইতিহাস লিখতে হবে। এই ইতিহাসের উজ্জ্বল নক্ষত্র হবে প্রায় ১.৫ হাজার তাজা প্রাণ এবং প্রায় ৩৫ হাজার আহতরা। এই বিপ্লবে যারা বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছে তাদের প্রতিদিন স্মরণ করার মাধ্যমে আমরা নতুন প্রজন্মের কাছে দেশপ্রেমের নতুন সংজ্ঞা হস্তান্তর করব।

বিপ্লব পরবর্তীতে বিভিন্ন ধারা ও প্রকৃতিতে প্রতিবিপ্লব একটি স্থায়ী বাস্তবতা। বিপ্লব পরবর্তীতে প্রায় চার মাসের বাস্তবতাকে আমরা উপলব্ধি করেছি। প্রতিবিপ্লব প্রতিরোধে সচেতনতা এবং সক্ষমতা রক্ষা করা আজকে আমাদের নাগরিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব অনুধাবন করত: নিজেকে বিসর্জনের জন্য পণ না করলে বিপ্লব বেহাত হয়ে যায়।

এই বিপ্লবে ন্যায় ও অন্যায়ের সংস্পর্শে ন্যায়ের জয় হয়েছে। ন্যায়ের জয়কে ধরে রাখা একটি নিরন্তর সংগ্রাম। আদর্শিক এই সংগ্রামে শয়তানের বারংবার আঘাত সহ্য করার জন্য মন, মানসিকতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা আবশ্যিকভাবে আমাদের বাস্তবায়ন করতে হবে। শয়তানের বিরুদ্ধে নিরন্তর এই সংগ্রামে আমাদেরকে ধৈর্য, সহনশীলতা এবং জ্ঞানের পরিচয় দিতে হবে।

বিপ্লব পরবর্তীতে জাতীয় জীবনের সকল স্তরে বিপুল আশা ও প্রত্যাশার জন্ম হয়েছে। এই আশা ও প্রত্যাশাকে সকল সময় ত্বরান্বিত রাখতে হবে। তার জন্য তৃণমূল পর্যায়ে সকল স্তরের মানুষকে বিপ্লবের আদর্শ ও তাৎপর্যসহ এবং আমাদের দায়িত্ব নিয়মিত আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে ত্বরান্বিত রাখতে হবে। আমাদের যেন আদর্শিক বিচ্যুতি না হয়। বিশেষত যারা নেতৃত্ব পর্যায়ে থাকবেন তাদের বিশেষভাবে সাবধান ও সতর্ক থেকে নেতৃত্ব দিতে হবে।

বিপ্লবের গতি ও তীব্রতার কারণে অনেক সূত্র/নিয়ম/নীতিমালা এখানে কাজ করেনা। জুলাই বিপ্লবের একটি নির্দিষ্ট আদর্শ রয়েছে। এই আদর্শে যেন কালিমা অস্বচ্ছতা এবং গতিজড়তা না আসে তার জন্য সবাইকে বিশেষত: ও ছাত্রদেরকে, তরুণদের সচেতন থাকতে হবে। তরুণেরাই ভবিষতের কাণ্ডারি। এই কাণ্ডারিদের প্রশ্নবিদ্ধ করে রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা থেকে অন্যদের সতর্ক থাকতে হবে।

যুগে যুগে বিপ্লব পরবর্তীতে নূতন সুযোগসন্ধানীদের জন্ম হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের গল্প আমাদের অজানা নয়। জুলাই বিপ্লব পরবর্তীতে একইভাবে “নব্য বিপ্লবীদের” সৃষ্টি হয়েছে। যারা জনগণের মাঝে মিশে থেকে বিপ্লবকে খেয়ে ফেলার জন্য নিরন্তর চেষ্টারত। এদেরকে এখনই স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে চিহ্নিত করে সর্বোচ্চ শাস্তি দিতে না পারলে বিপ্লব বেহাত হয়ে যাবে। বিপ্লবের আদর্শ ও স্বপ্ন ধ্বংস হয়ে যাবে। এর জন্য চাই নিরন্তর সতর্কতা জনসচেনতা এবং কার্যকরী ব্যবস্থাপনা।

বিপ্লব পরবর্তীতে সকল ক্ষেত্রে গতিজড়তার সৃষ্টি হয় এবং পূর্ববর্তী স্বৈরাচারের দোসরদের উপস্থিতি ও কার্যক্রম এই ক্ষেত্রে মূল, ভূমিকায় থাকে। এই বাস্তবতায় সকল স্তরে “পরিস্কার অভিযান” আবশ্যিক। স্বচ্ছতা ও ন্যায় পরায়ণতার সাথে এই অভিযান পরিচালনার উপর নির্ভর করে বিপ্লবের সফলতা ও উজ্জ্বলতা। সকল জনগণকে একত্রিত ও প্রভাবান্বিত করে এই কার্যক্রম পরিচালিত না হলে বিপ্লব ব্যর্থ হয়। তার জন্য চাই বাংলাদেশের বিপ্লবের নিজস্ব চরিত্র বিশ্লেষণ ও তা ধারণ করার প্রচেষ্টা।

বিপ্লব পরবর্তীতে কৃষি, কলকারখানা, অফিস, শিক্ষা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পেয়েছে। এই মুহূর্তে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তার স্থায়িত্ব প্রদানে সকলকে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত ও প্রণোদনা দেয়া আবশ্যক। একইভাবে অনুৎপাদন খাতে ব্যয় হ্রাস এবং বিদেশি প্রয়োজনীয় ও বিলাসদ্রব্য আমদানিনির্ভরতা কমিয়ে স্বনির্ভর ও বাংলাদেশী ব্যান্ড তৈরিতে সকল স্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করতে হবে। দেশের মানুষের দৈনিক কর্মঘণ্টা বাড়িয়ে এবং ছুটি/ অবসর সময় কমিয়ে কমপক্ষে আগামী এক বৎসর সমগ্র জাতিকে সাথে নিয়ে কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এখনই। তার জন্য তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠিত হওয়া দরকার।

এই বিপ্লবের অগ্রভাগে ছিল ছাত্ররা। তাদের এই অবদানকে স্বীকার করে তাদের হাতে দেশের নেতৃত্ব সৃষ্টির সকল সুযোগ সৃষ্টি করা আবশ্যক। তরুণ নেতৃত্বকে গ্রহণ করার জন্য সকল স্তরে ও প্রজন্মকে সহযোগীতা ও সহমর্মিতা প্রকাশ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে অনুরাগ/বিরাগ হবার সকল ইচ্ছাকে দমিত রাখতে হবে। এই তরুণ নেতৃত্বের উপর নির্ভর করছে; ভবিষৎ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নের বাস্তবায়ন। এই তরুন নেতৃত্বকে হতে হবে জ্ঞানী, শ্রদ্ধাবান এবং বিবেকবান। নেতৃত্বের হস্তান্তরের প্রক্রিয়ার ঐতিহাসিকতা ও বিধান তাদের স্মরণ রাখতে হবে।

বিপ্লবের পরবর্তীতে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ স্বৈরতন্ত্রের পরিধি ও প্রকৃতি অনুধাবন করা। আইনের শাসন সমুন্নত রেখে জড়িত ও সহযোগীদের অপরাধের শাস্তি প্রদান এবং জাতীয় সংহতি উন্নয়ন পুরো প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তাদের দেশের স্বার্থে উন্নয়ন ও অন্যন্যা কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত করা। এটি একটি কঠিন ও স্পর্শকাতর বিষয়। বাংলাদেশের বাস্তবতায় এটিকে দেখতে হবে এবং আমাদের নিজস্ব মডেল তৈরি করতে আমাদেরই তার বাস্তবায়ন করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন সুফল পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকৃতির অপরাধ, লুণ্ঠন, দূর্নীতি, সেচ্ছাচারিতা, দখল ইত্যাদির সাথে জড়িতদের বিষয়ে সঠিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ। এজন্য একটি "জাতীয় বিপ্লব তথ্য কোষ" অত্যাবশ্যক।

এই বিপ্লব আমাদের মনস্তাত্ত্বিক জগতের সকল স্তরে বিশাল পরিবর্তন এনেছে। বিশেষত শহিদ পরিবার এবং আহতদের ও তাদের আত্মীয়-স্বজন ও সতীর্থদের মধ্যে। সমগ্র জাতিকে বিভিন্নভাবে এই মনস্তাত্ত্বিক অবসাদগ্রস্ততা ও অন্ধকারকে দূরীভূত করার সকল প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে নেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব ও বাস্তবায়ন করার অঙ্গীকার, আজ অত্যন্ত জরুরি।

বাংলাদেশ আজ অপরাধ, নৈতিকতাহীনতা, দুর্নীতি ইত্যাদির কারণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। নূতন বাংলাদেশ গড়ার জন্য তাই আমাদের সবাইকে পরিবার ও শিক্ষার মূলে যেতে হবে। পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধ এবং শিক্ষক ও শিক্ষা ব্যস্থাপনাকে আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে নূতনভাবে এদেশের তরুণও জনগণকে উজ্জীবিত করতে হবে। দেশের আলোকিত মানুষেরা এবং প্রবাসে থাকা দক্ষ দেশেপ্রেমিক জনশক্তিতে সর্বোচ্চ সম্মান ও সুবিধা নিশ্চিত করা হলে আমরা অতি সহজে ও দ্রুততার সাথে মূল ও মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারবো। এটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা আবশ্যক।

দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, অসমতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সকল সুনাগরিকের জাতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য। জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে আমরা দেশকে রক্ষা করেছি। ছাত্র-জনতা ও সৈনিকের এই সম্মিলিত প্রচেষ্টা পৃথিবীতে বিরল। আজকে আমাদের ঘর ও বাহিরের শত্রু ও মিত্রকে চিহ্নিত করতে হবে। একই সাথে প্রতিটি নাগরিককে প্রচলিত (Traditional) ও অপ্রচলিত (Non Traditional) নিরাপত্তা সংস্কারকে চিহ্নিত করার আস্থা অর্জন করে দেশকে রক্ষা করতে হবে। জাতীয় ছাত্র বিপ্লবী ব্রিগেড তৈরির মাধ্যমে এর প্রাথমিক কাজ শুরু করা যেতে পারে। বাংলাদেশের একটি উপজেলা হলো শিবগঞ্জ। ইতিহাস বিখ্যাত পুন্ড্রনগর এবং করোতোয়া ও অন্যান্য নদী আমাদের গৌরবান্বিত করেছে। জুলাই বিপ্লবে আমাদের তরুনেরা পিছিয়ে ছিল না। তাদের আত্মহুতি (শহিদ জনাব মো. সেলিম মাস্টার ও শহিদ জনাব মো. রনির) অবদানকে আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। এখনও আহতরা তাদের ক্ষত চিহ্নকে বহন করছে। এদের অবদান ও নেতৃত্বকে মেনে নিয়ে সবাই একসাথে ভবিষ্যৎ শিবগঞ্জকে গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে "একতাই শক্তি" মূলমন্ত্রে সবাইকে দীক্ষিত হতে হবে। আমাদের কর্মকাণ্ড দেশের অন্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ুক এবং প্রমাণ করতে চাই ইতিহাসের পদচারণায় আমরাই নতুন ইতিহাস গড়ছি।

২০২৪'র ছাত্র গণঅভ্যুত্থান জাতীয় জাগরণের নতুন ধারা

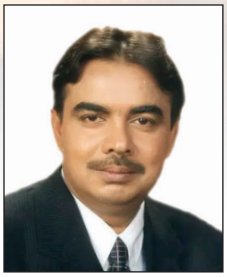

সাখাওয়াত হোসেন টুটুল
রাজনৈতিক চিন্তাকর্মী
চেয়ারম্যান, অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা
উপদেষ্টা, শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতি, ঢাকা

'Courage is being scared to death
but sadding up anyway'

---John Wayne

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের প্রচণ্ড ধাক্কায় আওয়ামী ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের আয়না ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। এই আন্দোলন জনগণের মনে অন্যরকম স্বস্তি ও আশাবাদ সৃষ্টি করেছে। এখন প্রয়োজন ছাত্র-গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া আশাবাদ ও স্বপ্ন বাস্তবায়নে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে রাষ্ট্রের ক্ষমতা কাঠামোকে যতদ্রুত সম্ভব সংস্কার করে একটা রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা।

এ মুহূর্তে দেশের মানুষের মধ্যে একই সঙ্গে রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে অস্বস্তি এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট প্রতিষ্ঠার আশাবাদের মিশ্র অনুভূতি কাজ করছে। মানুষ আশা করছেন ড. মুহম্মদ ইউনুস গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য রাষ্ট্র সংস্কার বা রাজনৈতিক সংস্কারে নেতৃত্ব দেবেন, অর্থনীতিকে ঠিকপথে ফিরিয়ে আনতে পারবেন এবং অন্য কোন স্বৈরশাসক কিংবা স্বাধীনতাবিরোধীদের উত্থানকে রোধ করতে পারবেন। বৈষম্যবিরোধী গণঅভ্যুত্থান ঔপনিবেশিক মডেলের রাষ্ট্র কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করে দেশজ রাষ্ট্র কাঠামো নির্মাণের সুযোগ করে দিয়েছে। ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে মানুষের চেতনায় একটি মুক্ত সমাজের স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষাও জেগে উঠেছে।

একটি জাতীয় জাগরণ যখন সর্বস্তরের মানুষকে আশাবাদী করে তুলে, যখন শুধু স্বতঃস্ফূর্ততা দিয়ে সেই জাগরণ বেশিদিন ধরে রাখা যায় না তাই এই জাগরণের পেছনে বৈষম্য নিরসনের মাধ্যমে মুক্তির যে আকাঙ্ক্ষাটি সামনে চলে এসেছে, তা বর্তমান আর্থ-সামাজিক। রাজনৈতিক ব্যবস্থার গণ্ডির মধ্যে থেকে রাষ্ট্রের সেবাদানকারী কিছু প্রতিষ্ঠানের সংস্কার করেই বৈষম্যমুক্ত রাষ্ট্র অর্জন করা সম্ভব নয়। কারণ, যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে ফ্যাসিবাদের বীজ রোপিত থাকে, শুধুমাত্র সংস্কার সাধনের মাধ্যমে সেই ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা পুনরায় ফিরে আসার সম্ভবনা বাতিল করা যায় না, সেই অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। আমাদের প্রয়োজন দেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে একাত্তরের চেতনায় দেশজ ধারার রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করা। যদিও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের বাইরের আর কোনো বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে ড. ইউনুসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয়নি। তিনি রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের জন্যই আপ্রাণ চেষ্টা করবেন বলে আমাদের বিশ্বাস এবং এটাও তাঁর বা তাঁর সরকারের কাছে কম চ্যালেঞ্জের নয়। রাষ্ট্রের ক্ষমতা কাঠামোর সংস্কার করে বৈষম্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা যতটুক জনগণের হাতে আনা যায় সেটুকুই এই মুহূর্তের প্রত্যাশা, যা দেশের জন্য কম কিছু নয়।

২০২৪ এর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান শুধু বাংলাদেশেই নয়, গোটা বিশ্বের ইতিহাসে এই অভ্যুত্থান নানা কারণেই খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এমন অভ্যুত্থানের উদাহরণ খুব একটা বেশি নেই, যা একটি ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রকাঠামোর দুর্গ ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। এবারের গণঅভ্যুত্থানের ভাষা ও মর্মকে মূর্ত করে তুলতে আমাদের ডিজিটাল শিল্পীরা হাতে তুলে নিয়েছিলেন অনলাইন পোস্টার ও ফেস্টুনের মতো দারুন এক অস্ত্র যা বৈষম্যবিরোধী অভ্যুত্থানের গণআকাঙ্ক্ষাকে আমাদের বর্তমান প্রজন্মের কাছে অর্থবহ ও সহজবোধ করে তুলেছে।

বৈষম্যবিরোধী গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে একটি ঔপনিবেশিক মডেলের রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তে দেশজ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একটি সত্যিকার গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ নির্মাণের যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তা কেবল শুধুমাত্র স্বতঃস্ফূর্ত জাতীয় জাগরণের মধ্য দিয়ে সম্ভব না। তবে ইতিহাসে এ রকম একটি জাতীয় জাগরণ অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। যা একটি জাতির জীবনে সবসময় ঘটেনা।

আজকে জাতির সামনে একটিই স্বপ্ন কোনো ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দেশের শ্রমজীবী কর্মজীবী পেশাজীবী অর্থাৎ আপামর জনসাধারণের জীবনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে, ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থা আর যেন দেখতে না হয়, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে তা সহজ ও স্পষ্ট করে কর্মসূচি আকারে তুলে ধরতে হবে জনগণের সম্মুখে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ঔপনিবেশিক মডেলের সংবিধানের সংস্কার নয়, আমূল পরিবর্তন কীভাবে করা হবে, তা পরিষ্কার করে জনসম্মুখে তুলে ধরা জরুরি।

দেশের অর্থনীতিতে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ প্রভৃতি সংস্থা ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর চাপিয়ে দেয়া অবাধ খোলা বাজার অর্থনীতির ব্যবস্থার ফলে অর্থনীতিতে যে পরনির্ভরতা উৎপাদনবিমুখ ফটকাবাজি প্রবণতা আমলা মুৎসুদ্দি লুটেরা পুঁজির যে অশুভ কর্তৃত্ব ও কালো টাকা নির্ভর অবাধে লুটপাটের ব্যবস্থা চলছে, তার বিলোপ সাধন করে এই ব্যবস্থার বিকল্পে কীভাবে একটি আত্মনির্ভরশীল উন্নয়নশীল উন্নয়নমুখী ধারায় জনগণের কল্যাণ ও জাতীয় অগ্রগতির লক্ষ্যে কৃষি ও শিল্পসহ সর্বক্ষেত্রে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ নিশ্চিত হবে সেরকম একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্মাণ করতে হবে। রাষ্ট্রীয় খাতকে অর্থনীতির নিয়ামক খাত ধরে সমবায়ী খাত, ব্যক্তিখ্যাত, মিশ্রখাতের সুপরিকল্পিত ভূমিকা কীভাবে একচেটিয়া লুটেরা অর্থনীতির ধারাকে প্রতিরোধ করে একটি বৈষম্যহীন ও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার ধারা নিশ্চিত করবে তাও রাষ্ট্রকেই করতে হবে।

দেশের সাধারণ মানুষ মনে করছে একটি গণঅভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে দেশ আজ ফ্যাসিবাদের সর্বগ্রাসী সংকট থেকে মুক্তি পাবে। এটা মানুষের আশাবাদ। এমন আশা থাকতেই পারে। কিন্তু মানুষের আশাবাদ ও দেশের বর্তমান আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধনের উপযুক্ত সামাজিক শক্তির ভিত্তি সমার্থক নয়। কাজেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কতগুলো সংস্কার সাধন করলেই ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে মানুষের মুক্তি মেলা সম্ভব নয়।

তাই মুক্তির লক্ষ্যে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিবর্তনের পক্ষে পরিবর্তনে বিশ্বাসী রাজনৈতিক শক্তি এবং শ্রমজীবী কর্মজীবী পেশাজীবীদের বৃহত্তম সমঝোতা ও ঐক্য গড়ে তোলা অনস্বীকার্য। মনে রাখতে হবে আমাদের আছে স্বাধীনতা সংগ্রাম আর মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহ্য। আছে অপরিসীম ত্যাগ ও সংগ্রামের গৌরব। আমাদের 'স্বদেশপ্রেমি প্রজন্ম' ও জনতার জাতীয় জাগরণ যেভাবে সমগ্র জাতিকে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখিয়েছে, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের কর্তব্য দায় আমাদের ওপর বর্তেছে।

বর্তমান প্রজন্মের প্রতি বিচার বিশ্লেষণে যদি অবিচার না করা হয় তাহলে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় তারা বাংলার কালবৈশাখীর মতো অসীম সাহসী, উদারতা, মমত্ববোধ, আত্মবিশ্বাস এবং নিখুত দেশপ্রেম তাদের করেছে বাঙালির এক বিরল উত্তরাধিকার। ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত বাঙালির সকল আন্দোলনগুলো বিশ্লেষণ করলেই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারীদের প্রকৃত পরিচয় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে। ইতিহাসের কোনো অসত্য ঘটনার সাথে তুলনা করে এদেরকে মূল্যায়ন করলে সত্যের প্রতি অবিচার করা হবে। ইতিহাসের সত্য হলো তারা সমকালীন সময়ে বাঙালির দেশজ রাষ্ট্রব্যবস্থার দর্শন নিয়ে এসেছে।

প্রজন্মের অদলীয় রাজনৈতিক চিন্তার এই পরিবর্তনশীলতা ও পথ পরিবর্তনের মূলে রয়েছে তাদের বাস্তবতার সত্যানুসন্ধানের প্রচেষ্টা এবং জীবনের ব্যাপকতার রূপের মধ্যে তার অস্তিত্বপ্রাপ্তি। তারা আধুনিক চিন্তার আলোকে স্বনিষ্ঠ পথের সত্যরূপ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের প্রচেষ্টার মধ্যে ভ্রান্তি আছে কিনা জানি না, তবে কোনো মতান্ধতা বা গোঁড়ামি যে নেই তা বেশ জোরের সঙ্গেই বলা যায়। বস্তুত তাদের স্বচ্ছ নির্মোহ দৃষ্টি এক সত্য নিরীক্ষণের আশায় সুদূর প্রসারিত করে রাখে; মানবতার বাণী যেখানেই ধ্বনিত হয়, সেখানেই তারা কান পেতে শুনে এবং মর্মমাঝে গ্রহণ করে।

প্রজন্মের কোটা আন্দোলন আজ অদলীয় সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়ে কোটা থেকে রাষ্ট্রব্যবস্থার সংস্করের কথা বলছে। একটি ইতিহাসের পটভূমি তাদের অবলম্বন হয়েছে অন্যদিকে বর্তমানের স্বরূপ আবিষ্কারে তাদের ভূমিকা নির্ণয় করতে চেয়েছে। তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জিজ্ঞাসার উৎস হলো ঔপনিবেশিক মডেলের ফ্যাসিবাদী শাসনের বিভীষিকা অর্থাৎ বৈষম্যমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা।

সামাজিক ব্যবসা ও থ্রি-জিরো তত্ত্ব কি পারবে মানবিক বিশ্ব গড়তে?

কৃষিবিদ মুহাম্মদ তাহাজ্জত আলী
সাবেক সাধারণ সম্পাদক, শেকৃবি সাংবাদিক সমিতি ও
কৃষিবিষয়ক সম্পাদক, শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতি, ঢাকা

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ও শান্তিতে নোবেল জয়ী বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন: "সম্পদকে কয়েকটি হাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা নয়, বরং তা সবার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া দরকার। তাহলেই একটি মানবিক বিশ্ব গড়ে উঠবে।"

সম্পদ কেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়া বন্ধ করা না গেলে পৃথিবী আরো বিভক্ত ও অস্থিতিশীল হয়ে উঠতে পারে। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, পৃথিবীর মোট সম্পদের একটি বড় অংশ অল্প কিছু ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে। Oxfam-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বের শীর্ষ ১% ধনী মানুষের কাছে মোট সম্পদের প্রায় ৫০% রয়েছে। বিশেষ করে বিশ্ব ব্যবসায়ী মহলের সিন্ডিকেটের দখলে যাচ্ছে। ম্যারিটোক্রেসি পলিটোক্রেসির নিকট পরাজিত হচ্ছে। আরো সহজভাবে বললে পলিটোক্রেসি খারাপ ব্যাবসায়ীদের দখলে যাচ্ছে। খারাপ ব্যবসায়ী বলছি কারণ কত শতাংশ কোন ব্যবসায়ীরা লাভ করতে পারবে সেই নীতিতে তারা ব্যবসা করছে না, যে যার মতো শতাংশ হারে ব্যবসা করছে। গবেষণা বলছে, যখন ম্যারিটোক্রেসি পরাজিত হয় তখন মানবিক বিশ্ব গঠনে অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হয়। তাই দুটোর মধ্যে একটা ভারসাম্য রাখতে হয়। প্রযুক্তি, আর্থিক সেবা এবং বহুজাতিক কোম্পানির মালিকানা এই কেন্দ্রীকরণের পেছনে প্রধান কারণ। একটি ন্যায়সঙ্গত, মানবিক এবং টেকসই পৃথিবী গড়তে হলে সুষম সম্পদ বণ্টনের জন্য সবাইকে দ্রুত এগিয়ে আসতে হবে নতুবা দ্রুত পৃথিবী বসবাসের জন্য হুমকির সম্মুখীন হবে।

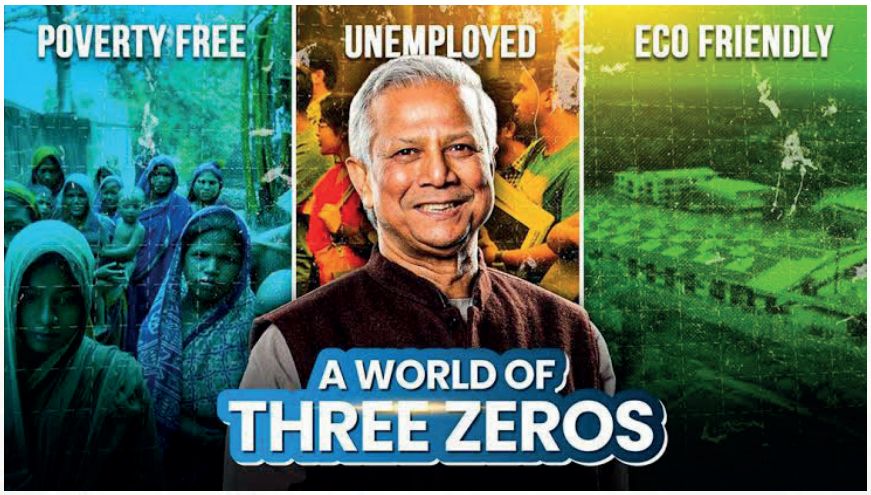

সামাজিক ব্যবসা (Social Business) বর্তমানে ৭০টিরও বেশি দেশে চালু আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশে বিস্তৃত যেমন এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা এবং ওশেনিয়া। প্রতিটি দেশেই এর প্রকৃতি এবং কার্যক্রম সেই দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সমস্যার উপর নির্ভর করে আলাদা আলাদা। যেমন আফ্রিকায় বিদ্যুৎ, পানি, স্বাস্থ্যসেবা এবং গ্রামীণ এলাকাগুলোতে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সোলার প্যানেল প্রকল্পগুলো ব্যাপক প্রচলিত। ইউরোপে গ্রামীণ ক্রেডিট এগ্রিকোল এবং বিভিন্ন পরিবেশবান্ধব প্রকল্প চলছে। আমেরিকায় স্বাস্থ্যসেবা এবং খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সামাজিক ব্যবসার প্রসার ঘটেছে।

জার্মানিতে গ্রামীণ ক্রিয়েটিভ ল্যাব সামাজিক ব্যবসা নিয়ে গবেষণা এবং নতুন উদ্যোগ তৈরিতে কাজ করে। ভারতে জীবিকা নামক প্রকল্পে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে কাজ করে। বিশেষত, কৃষিভিত্তিক কর্মসংস্থান এবং দক্ষতা উন্নয়নে কাজ করে। ফ্রান্সের গ্রামীণ ক্রেডিট এগ্রিকোল অন্যতম বড় সামাজিক ব্যবসা উদ্যোগ। এটি কৃষি এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ঋণ প্রদান করে। গ্রামীণ ব্যাংক এবং ডানন কোম্পানির যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশে গ্রামীণ দৃষ্টিহীনতা নির্মূল প্রকল্পের মাধ্যমে দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য কম খরচে চক্ষু চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হচ্ছে। পুষ্টি সমস্যা সমাধানে তৈরি করা দই "শক্তি দই" খুবই জনপ্রিয়। এতে শিশুদের প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও পুষ্টি উপাদান যোগ করা আছে। বিস্তারিতভাবে বলতে চাচ্ছি না, তবে আমার মনে হয় আমাদের দেশে এ ব্যবসা সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণা অনেক কম, সময়ে এসেছে এ ব্যবসার জনক দেশ হিসেবে তরুণ যুব সমাজকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সমস্যার সমাধানে দ্রুত কাজ শুরু করা।

বলা হচ্ছে সামাজিক ব্যবসা (Social Business) এমন একটি ব্যবসায়িক মডেল, যেখানে মূল উদ্দেশ্য হলো সামাজিক সমস্যা সমাধান করা, মুনাফা অর্জন করা হলেও সেটা কোনো ব্যক্তিগত লাভের জন্য নয়, বরং সেই মুনাফা আবার ব্যবসার উন্নতি এবং সমাজকল্যাণে ব্যবহৃত হয়। এখন প্রশ্ন আসে, ব্যবসায় কোনো লাভ না থাকলে যুব সমাজ/তরুণ প্রজন্ম বা ব্যবসায়ীরা কেনইবা এ ব্যবসায় আসবে?

হ্যাঁ যুবকরা আসবে, কারণ জুলাই গণ অভ্যুত্থানের পর তরুণরা যে পারে, তা পুরো পৃথিবীকে জানিয়ে দিয়েছে জেন জেড জেনারেশনখ্যাত এদেশের তরুণ প্রজন্ম। দেশে তো একশ্রেণির মানুষের মুখে ফেনা তুলত এ জেনারেশন উচ্ছে যাচ্ছে,তাদের দ্বারা কিছু হবে না, তারা বেশি পেকে গেছে।